AUG 10 2002

শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী নির্যাতন ঘটনার একটি বিশ্লেষণ

মমতাজ লতিফ

বর্তমানে সরকারের ঠ্যাঙ্গারে চরিত্র প্রমাণ করে যে, তাদের মূল এজেন্ডা— গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়, বরং বিরোধী রাজনীতি নির্মূলই তাদের প্রধান এজেন্ডা, যা তারা অবিচলিতভাবে অব্যাহত গতিতে চালিয়েই যাচ্ছে; পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, মেয়েদের উপ-বৃত্তির বিস্তৃতি ইত্যাদি ছোট ছোট কিছু কাজ করে তাদের জনকল্যাণের কিছু প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করছে। যদিও এসব দিয়ে তাদের নির্যাতন ও দখল নীতির যন্ত্রণার ওপর প্রলেপ পড়ছে না, তবুও পরপর অনেকগুলো বেসরকারি বিদ্যালয় ও সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অপসারণ, রাষ্ট্রপতি অপসারণ, আদমজী বন্ধ, আসন্ন টেক্সটাইল মিল- সেরিকালচার মিল বন্ধ, ব্যাংকের শাখা বন্ধ থেকে সাম্প্রতিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর বর্বর নির্যাতন পর্যন্ত ঘটনাগুলোকে নিচের দিকের কোন কোন কর্মকর্তার হঠকারী আকস্মিক কাজ বলে ভুল করার কোন অবকাশ নেই। এগুলোর ফলে একদিকে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী জীবিকাহীন হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে কোন এক অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

শামসুন্নাহার হলের ঘটনা, উপাচার্যের পদত্যাগ সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন অনেকজনের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। কেন সামান্য; তুচ্ছ একটি কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী হলে মধ্যরাতে এ স্বদেশী পুলিশের বর্বরতা ঘটানো হলো?

কেন যখন পাকিস্তানের স্বনিয়োজিত রাষ্ট্রপতি এদেশ ভ্রমণে আসছে, তখনি এরকম একটি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটানো হলো? পারভেজ মোশাররফ থেকে জাতীয় দৃষ্টি কি অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার দরকার ছিল? এ ঘটনায় অবশ্যই পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট মুচকি হেসে গোঁফে তা দিয়েছে। আমরা তো নিজের পায়ে কুড়াল মেরেও আরেক বাঙালির ক্ষতি করতে রাজি। সুতরাং নিজের মেয়েদের পুলিশের বর্বরতার হাতে ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানি প্রভুর মনোরঞ্জন করেছি '৭১-এ। এখনো তো সে প্রেতেরা, তাদের ভূত-পেত্নি-পিশাচ সন্তানরা সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুতরাং একই কাজ আরেকবার করতে বাধা কোথায়?

শোনা যাচ্ছে, পুলিশের দু' সহিংস কর্তাব্যক্তি অতীতে ছিলেন ছাত্রদল ক্যাডার। প্রশ্ন হচ্ছে— শুধু দু'জন পুলিশ নিজস্ব ইচ্ছায় এত বর্বর ও বেপরোয়া আচরণ করার সাহস রাখে, যদি তাদের প্রতি ওপরতলা থেকে কোনরকম ইঙ্গিত না থাকে?

প্রশ্ন জাগছে, সরকারি দল থেকে কর্তৃত্বশালী কেউ, নাকি সরকারের মধ্যে অবস্থিত সহিংসেতা ও ষড়যন্ত্র পছন্দকারী কেউ এ ঘটনাটির পরিকল্পনা করেছে? যদি কর্তৃত্বশালী কেউ এ নির্দেশ না দিয়ে থাকে, তাহলে এসব ছোট পুলিশ কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বে পুরো বিবেককে নাড়া দেয়ার মতো এমন কাণ্ড ঘটাতে সক্ষম বলে অধিকাংশ ব্যক্তিই মনে করে না। এ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ মাঝে-মধ্যেই এবং বর্তমান ঘটনা সম্পর্কেও মত প্রকাশ করেছেন, কোথা দিয়ে কি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। অর্থাৎ তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের অজান্তেও ঘটনা ঘটা সম্ভব এবং ঘটছেও।

একথা সত্য হলে বলতে হয়, তাহলে সরকারের ওপর আরও এক গুপ্ত সরকার রয়েছে যারা অনেক অভাবনীয় অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার পরিকল্পনাকারী এবং নির্দেশকারী। আর যদি এ কথা সত্যকে ঢেকে রাখার মিথ্যাচার হয় যা এ সরকারের বহু মন্ত্রী-সাংসদ করে চলেছেন— তাহলে একথা ধরে নিতে হয় যে, আসলে সবকিছুই পরিকল্পনামাফিক ঘটেছে, উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হয়ে ছাত্রদল ক্যাডার (নারী ক্যাডার?) পর্যন্ত অবহিত হয়ে এবং নির্দেশিত হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

পরিকল্পনামাফিক মধ্যরাতে ছাত্রী নির্যাতনের মতো বিপুল প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটানোর মতো ঝুঁকি গ্রহণ করার কারণ কি? তবে কি এ ঘটনাটি ঘটিয়ে এর চেয়েও আরও বড় কোন ঘটনাকে হালকা করে দেয়ার দরকার ছিল? এ সময়ে কি কি ঘটনা ঘটেছে?

এ সময়ে ঢাকায় পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতির আগমন ঘটেছে, যে স্বৈরশাসক আমাদের প্রাক্তন গণতান্ত্রিক রীতিতে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বাতিল করে তার স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রমাণ দিয়েছিলেন, সে সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল; কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী সরকার এই স্বৈরশাসককে বিপুল সংবর্ধনা দেয়ার ব্যবস্থা করে তার প্রতি নতজানু নীতির প্রমাণ রেখেছে। তবে সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে এ স্বৈরশাসক নিজস্ব দায়িত্বে '৭১-এ পাকিস্তানিদের বাড়াবাড়ি ও নির্যাতনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার নমনীয়তা দেখিয়েছে। প্রশ্ন থাকে, জাতিসংঘে সাধারণভাবে স্বৈরতন্ত্রকে উৎসাহ না দেয়ার সাধারণ আহ্বানে যে ব্যক্তি সামান্যতম সৌজন্য দেখাতে অপারগ, সে কেন এতটা নমনীয় হলো, বিশেষত বাঙালির নাড়ির যন্ত্রণা '৭১-এর পাকিস্তানি হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন সম্পর্কে, যে বিষয়টি সম্পর্কে বেনজির ভুট্টোও কিছু জানেন না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পারভেজ মোশাররফ নিজেই নিজের প্রশংসাও করেছেন; বলেছেন, 'আমি অনেক বেশি বলেছি' অর্থাৎ বাংলাদেশকে যেন তিনি আশার অতীত এক বিপুল উপহার দিয়ে ধন্য করেছেন!

কথা হচ্ছে— কেন এই ব্যক্তির এ পরিবর্তন? শুধু বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য কি তাকে বাংলাদেশ ভ্রমণে আসতে হয়? এসব চুক্তি তো মন্ত্রী, এমনকি সচিব পর্যায়েও হতে পারে। চা ও পাট বিক্রি তো মন্ত্রী, সচিব পর্যায়ে হতে পারে এবং চা ও পাট পাকিস্তানের সাধারণ আমদানি পণ্য, এর মধ্যে নতুন কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা জনগণ বুঝতে পারছে না।

কথাটা আর একটু ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দেখা যাক, পারভেজ মোশাররফ এখন কি অবস্থায় আছেন। তার দ্বারা গৃহীত মৌলবাদবিরোধী কঠোর পদক্ষেপ, মাদ্রাসা-মসজিদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ, ভারতের কাশ্মিরে জঙ্গি সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ, সাংবাদিক পার্লের হত্যাকারী জঙ্গির মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি কাজকর্ম আমেরিকার চাপে পড়ে করলেও তিনি একই সঙ্গে বুঝতে পারেন তার আশপাশে আইএসআইসহ সামরিক-অসামরিক মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বেড়ে ওঠা মৌলবাদিতা, সেসব ইসলামি জেহাদ সংক্রান্ত মতের অনুসারী-সমর্থকদের একটি বিশাল অংশ রয়েছে, যারা তার এ আমেরিকান চাপে গৃহীত নীতির প্রবল বিরোধী থাকবে এবং সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে। আমেরিকা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' হাজার হাজার পাউন্ড বোমা ফেলেও যখন তালেবানের আসল নেতাদের গ্রেফতার করতে পারেনি, হত্যা করতে পারেনি তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, এরা কাদের সাহায্য-সমর্থনে এখনো লুকিয়ে প্রাণে বেঁচে রইল? আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাসের সুযোগে সেখানেই তাদের থাকার কথা নিরাপদ আশ্রয়, বিশ্বস্ত বন্ধু, সমর্থক সহযোদ্ধা। হয়ত হামিদ কারজাই এবং মোশাররফকে এমন অনেক তালেবান বা ইসলামি জঙ্গি বন্ধুদের সাহায্য করতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে; কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন চালানো কঠিন। অন্তত মৌলবাদীদের জন্য পাকিস্তানের বাইরে অন্য কোথাও কোন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করা গেলে তা হতো পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতির জন্য স্বস্তির বিষয়, এমনকি কারজাই-এর জন্যও হতো স্বস্তির এবং আমেরিকার জন্য হতো মুখরক্ষা। এ বিষয়ে ঢাকার রসিক ব্যক্তিরা একটি চুটকি উদ্ভাবন করেছেন। তারা বলেন— 'লাদেন অবশ্যই মোশাররফের বাসভবনে আরামে-আয়াসে বাস করছে। শত্রুর জন্য শত্রুদলের বাদশার রাজপ্রাসাদই তো পৃথিবীতে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।' এ চুটকিটি সবার মধ্যে হাস্যরোলের জন্ম দেয়। তবে এটাও তো প্রশ্ন— এত তালেবান, এত জঙ্গি গেল কোথায়? ভোজবাজির মতো তাদের পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে যাওয়ার কথা তো নয়!

হাওয়ায় হাওয়ায় আরও গুজব ছড়িয়েছে। কারও কারও অভিমত, এশিয়ান হাইওয়ে নিয়ে হঠাৎ সরকার এত ব্যক্তিব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণ নাকি বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া পর্যন্ত তেল- গ্যাসের অধিকার সুরক্ষায় আমেরিকাকে সহায়তা দেয়া। বাণিজ্য তো চলছেই, তা আরও একটু বাড়বে; কিন্তু তার বদলি কি বঙ্গোপসাগরের নিচের তেল-গ্যাস চলে যাবে বিদেশীদের হাতে? এসব গুজব, তথ্য বা সত্য, প্রমাণভিত্তিক কোন কথা নয়; কিন্তু মানুষ এসব কথা ভাবছে— প্রশ্ন করছে নানাজন নানাজনকে। মাটির ওপর দিয়ে না হয়ে পানির নিচে দিয়ে পাইপলাইন কি হতে পারে না— অনেকেই এমন কথা ভাবছে।

এসব ভাবনার মূল হলো দেশপ্রেম, একথা ভুললে চলবে না। একমাত্র খাঁটি দেশপ্রেমিকই স্বদেশের সম্পদ লুটের ব্যাপারে চিন্তিত হয়, দেশের প্রগতিশীল আদর্শ, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, বিপন্ন হতে পারে, এমন কোন গোষ্ঠীর উত্থানে অবশ্যই দেশপ্রেমিক জনগণ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শ্রমিক, মুক্তিযোদ্ধা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না।

বর্তমানে সরকারের ঠ্যাঙ্গারে চরিত্র প্রমাণ করে যে, তাদের মূল এজেন্ডা— গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়, বরং বিরোধী রাজনীতি নির্মূলই তাদের প্রধান এজেন্ডা, যা তারা অবিচলিতভাবে অব্যাহত গতিতে চালিয়েই যাচ্ছে; পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, মেয়েদের উপ-বৃত্তির বিস্তৃতি ইত্যাদি ছোট ছোট কিছু কাজ করে তাদের জনকল্যাণের কিছু প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করছে। যদিও এসব দিয়ে তাদের নির্যাতন ও দখল নীতির যন্ত্রণার ওপর প্রলেপ পড়ছে না, তবুও পরপর অনেকগুলো বেসরকারি বিদ্যালয় ও সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অপসারণ, রাষ্ট্রপতি অপসারণ, আদমজী বন্ধ, আসন্ন টেক্সটাইল মিল- সেরিকালচার মিল বন্ধ, ব্যাংকের শাখা বন্ধ থেকে সাম্প্রতিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর বর্বর নির্যাতন পর্যন্ত ঘটনাগুলোকে নিচের দিকের কোন কোন কর্মকর্তার হঠকারী আকস্মিক কাজ বলে ভুল করার কোন অবকাশ নেই। এগুলোর ফলে একদিকে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী জীবিকাহীন হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে কোন এক অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এসব আচরণ গণতন্ত্রের একেবারে বিপরীত যা কেবল স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গেই খাপ খায়। এর সঙ্গে একবার গত অক্টোবর নির্বাচনের নানা অপকৌশলের তুলন করে দেখলে দেখা যায়, ওইসব স্বৈরতান্ত্রিব অপকৌশল দিয়ে গণতান্ত্রিক খোলসে আসলে এব স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই এ সরকারের লক্ষ্য, নতুব সংসদে বিরোধীদলকে আনার আয়োজনে ছিল ন কোন আন্তরিকতা, বরং বিরোধীদল নিজ দায়িত্বেই সংসদে গিয়েছিলেন জনগণের বিরুদ্ধে নির্যাতনের বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে। তখনো পর্যন্ত সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়নি এবং প্রধানমন্ত্রীর জনগণের কাছে জবাবদিহি করার রীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বটি খালেদা জিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এটি আর যাই প্রমাণ করুক না কেন, গণতন্ত্রপ্রীতি বা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং জনগণকে সম্মান করার রীতি প্রমাণ করে না।

সবশেষে প্রশ্ন করছে অনেকেই, খালেদা জিয়া মহিলা হয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের ছাত্রীদের বর্বর নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরও কেন তিনি তাদের কাছে গিয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করলেন না?